**ATMADEEP**
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 498-508
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.037**

# আধুনিক ভাষ্যে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় সাহিত্য: কবি বিষ্ণু দে-র কাব্য সমগ্র

**ড. অসিত বিশ্বাস,** *ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.12.2024; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

***Abstract***

*The evolution of poetry draws inspiration from ancestral traditions, embracing both heritage and innovation. Modern Bengali literature reflects a fusion of ancient and medieval Indian literary archetypes, shaped by the implementation of the Charter Act on one hand and the emergence of modern sensibilities on the other. This adaptation was pioneered by Michael Madhusudan Dutt and continues to evolve, even in the era of artificial intelligence.*

*The poetry of Bishnu Dey, spanning from the 1930s to the 1980s, exhibits traces of literary imitation. His early works, particularly the first three collections—before the influence of Rabindranath Tagore's Purana and Marxian philosophy—are deeply rooted in Vedic and Upanishadic sources. From the 1940s to the 1960s, his poetry increasingly reflects the influence of the Vedas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, and classical Sanskrit literature. However, by the 1970s, this tendency towards imitation appears to decline.*

*This essay examines Dey's poetry through the lens of alliteration theory, offering a brief introduction to its sources and stylistic patterns. Special attention is given to identifying his creative tendencies while minimizing redundant references to the same literary influences.*

**Keyword:** *Poetry Emancipation, Ancient Archetypes, Medieval Indian Literature, Bishnu Dey, Imitation in Poetry, Vedic and Upanishadic Influence.*

যা আধুনিক নয়, সেই আখ্যান আধুনিক যুগে কেন পুনরাবৃত্ত হবে? রবীন্দ্রনাথ আধুনিকের পরিচয়ে যে 'মর্জি'র কথা বলেছিলেন সেই নির্দেশ মেনে কীভাবে অনাধুনিক হয়েও আধুনিক সাহিত্যে অন্তর্গত হয়? কবে থেকে, কীভাবে, কেন, কোন ভাষ্যে এই অনুসৃজন – এসব কূটাভাস স্মরণে রেখে 'আধুনিক ভাষ্য' সন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে একটি অভিব্যক্তি করে বলেছিলেন যে পূর্বজদের নিকট থেকে কৃতাঞ্জলিপুটে ঋণ গ্রহণেই কাব্যের সমৃদ্ধি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মেনে সেই ঋণের অনুসৃজন হতে হবে আধুনিক চেতনায়। কেবল আখ্যানের সূত্র হতে পারে অনাধুনিক কালের। একবিংশ শতকে যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-র সঙ্গে মানব সভ্যতার অসম লড়াই শুরু হয়েছে তখন অনাধুনিক বিষয়ের অনুবর্তন কতখানি প্রাসঙ্গিক

হতে পারে? আসলে 'মর্জি'র ভাষ্য বলে দেয় বিষয়টি কালের নয়, ভাবের কথাই আধুনিকতার স্বীকৃতি। বাংলা সাহিত্যে এই অনাধুনিকের অনুবর্তন শুরু হয়েছিল অনুবাদ সাহিত্যের সূত্রে এবং আধুনিক যুগে সামাজিক এবং প্রশাসনিক উদ্যোগে। উনিশ শতকের নবজাগরণে একদিকে সামাজিক প্রয়াস এবং 'সনদ আইন' প্রয়োগ করে প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে এই অনুবর্তন-অনুসৃজনের শুরু হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে এই ধারাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ভারতীয় সংস্কৃতির দুটি ধারা:

ক) প্রাগার্য,

খ) আর্য-ব্রাহ্মণ্য।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্য বিকাশের ধারায় আর্য-সংস্কৃতিতে আর্যেতর উপাদান ক্রমশঃ মিশ্রিত হয়েছে। দর্শনে ও পুরাণে এই মিশ্রণ একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত রূপে প্রতিষ্ঠিত। আবার তন্ত্রে বিপরীত ধারা দেখা যায় - আদিম সংস্কৃতির উপর ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়েছে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব। প্রাগার্য বাংলাদেশ অর্থাৎ পুণ্ড্র-সুহ্ম-বঙ্গ-রাঢ় পুলিন্দ-শবরাদির আদি ভূমি এবং ধর্ম-কর্ম-সাহিত্যের মূলে ছিল লৌকিক সংস্কার। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব এদেশের মর্মমূলে প্রসারিত। এই লৌকিক সংস্কার একদিকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে বাঙালির সংস্কৃতিকে একটি বিশিষ্ট রূপে রূপায়িত করেছে। এই লৌকিক ভাবের উপর আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব-প্রতিষ্ঠাই বাংলার ধর্ম ও সাহিত্য (প্রাচীন ও মধ্য এবং অংশত আধুনিক বাংলা সাহিত্য) বিকাশের মূলসূত্র।

সংস্কৃতি ও সাহিত্যে প্রভাব গ্রহণের দুটি মূল প্রবণতা দেখা যায়:

ক) গতানুগতিক পথে পুরাতনের ভাব গ্রহণ এবং

খ) সমন্বয়ের পথে আত্মীকরণ।

এই দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রভাব গ্রহণেই মৌলিকতা অধিক। অনুবাদ সাহিত্যে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে একটি বহিরাগত ভাব যখন স্রষ্টার মর্মস্থান অধিকার করে কবির রচনা-ভাবনাকে অন্তর থেকে প্রভাবিত করে থাকে এবং তার ফলে কবির সৃষ্টি স্বতঃপ্রফুল্ল ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়, তখন সেই প্রভাব স্থায়ী ভাবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ফলে নবাগত ভাবের স্পর্শে স্রষ্টার 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা' প্রজ্ঞার নব নব প্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রতিভাবান কবি-চিত্তে এই ধরণের প্রভাবই গূঢ়সঞ্চারী ও সার্থক।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য - ক) হিন্দুর অষ্টাদশ বিদ্যা - বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি এবং খ) সংস্কৃত রসসাহিত্য ও মধ্য ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সাহিত্য (পালি, বৌদ্ধ, সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ)। এই দ্বিতীয় ভাগই প্রকৃত রস-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই দ্বিতীয় ভাগেই প্রভাব বাংলা সাহিত্যে গুরুতর। তবে বিস্ময়ের বিষয় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মূলত দেবায়ত প্রেমকবিতার ধারা ব্যতীত অন্য ধারার সাহিত্য রক্ষিত হয়নি বা সৃজিত হয়নি।

কবি বিষ্ণু দে-র কবিতায় পুরাকল্পের অনুসৃজন প্রধানত তিনটি ধারায় ঘটেছে - লোকায়ত, গ্রিক রোমানসহ বহু পুরাকল্প এবং ভারতীয় বিশেষত সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যে ব্যবহৃত পুরাকল্প। তাঁর প্রথম কাব্যের শিরোনাম 'উর্বশী ও আর্টেমিস' নামের এই উর্বশী কোন কবিকল্পিত চরিত্র নন। উর্বশী-র[1] পূর্বসূত্র পরিচয়ে জানা

[1] উর্বশী - অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা (১), ২য় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ), কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫ (২০০১), পৃ ২৩৮-২৪১।

যায় - স্বর্গের এক রূপবতী অপ্সরা। সমুদ্র মন্থনে যে অপ্সরারা উঠেছিল, উর্বশী তাদের মধ্যে অন্যতমা। উর্বশীর উল্লেখ পাওয়া যায় 'ঋগ্বেদ', 'শতপথ ব্রাহ্মণ', 'মহাভারত' ও 'পদ্মপুরাণে'। মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে উর্বশী এবং রাজা পুরুরবার প্রণয় কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। কবি বিষ্ণু দে-র প্রতিটি কাব্যেই চরিত্র-ঘটনা কিংবা শব্দ, ব্যঞ্জনা বা রূপকের অনুবর্তন ঘটেছে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে কাব্যবিশ্লেষণ রীতি এবং পূর্বসূত্রের পরিচয় সাপেক্ষে কবি বিষ্ণু দে-র কাব্যে কীভাবে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় প্রসঙ্গ এসেছে বা আধুনিক ভাষ্যে অনুসৃজিত হয়েছে তার সন্ধান করা হবে। পূর্বসূত্রের প্রেক্ষিতে কবি বিষ্ণু দে-র কাব্যের পর্যালোচনা করা হল।

**ক. বেদ:** 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যের প্রথম কবিতা 'পলায়ন'-এ কবি লিখেছেন 'উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে'[2]। উর্বশীর প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। 'বেদের মতে মিত্রাবরুণ আদিত্য যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে অপ্সরা উর্বশীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ায় ওঁদের রেতপাত হয়। রেতের যে ভাগ কুম্ভে পড়ে, সে ভাগ হতে বশিষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। এতে এই দুই দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে উর্বশীকে অভিশাপ দেন যে, তাঁকে পৃথিবীতে নির্বাসিতা হতে হবে। এখানে এসে উর্বশী পুরুরবার স্ত্রী হ্ন।'[3]

'পূর্বলেখ' কাব্যের উৎসর্গ পত্রে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। আসলে এই মন্ত্রের প্রসঙ্গটি এসেছে সদ্য প্রয়াত কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সূত্রে। অথর্ব বেদের দুটি ভিন্ন সুক্তের অংশ একত্রিত করে কবি উদ্ধৃত করেছেন –

'হুয়ামি মে মনসা মন ইহেমান্ গৃহান্ উপজুজুষাণ এহি।
সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেন স্যোনাস্ত্বা বাতা উপবান্তু শগ্মাঃ।
ইহৈবৈধি ধনসনিরিহ চিত্ত ইহক্রতুঃ।
ইহৈধি বীর্যবত্তরো বয়োধা অপরাহতঃ।'[4]

মন্ত্রটির অর্থ – 'হে প্রেত পুরুষ, তোমার মন আমাদের মনের সাথে এ লোকে আহ্বান করছি। আমাদের গৃহে তোমার উদ্দেশ্যে যে ঔর্ধ্বদেহিক কর্ম করা হচ্ছে, তাতে প্রীত হয়ে এস। সংস্কারের পর পিতৃ, পিতামহ, প্রপিতামহদের সাথে এবং পিতৃগণের অধিপতি যমের সাথে মিলিত হও। পিতৃলোক গমনকালে তোমার যে পথশ্রম হয়েছে, তা অপোনদনের জন্য নিরন্তর সুখকর বায়ু তোমার কাছে প্রবাহিত হোক।'[5] পরবর্তী ছত্র দুটির অর্থ – 'হে দীপ্ত পাংসুতে আহিত, উন্মুক তুমি পাংশুরূপ প্রদেশেই থাক, আমাদের ধনদাতা হও, এখানে প্রজ্ঞাতা হও, এখানে আমাদের কর্ম সম্পাদক হও এখানে বলবান অন্নের বিধাতা হও ও শত্রুর দ্বারা অপরাজিত হয়ে অবস্থান কর।'[6]

---

[2] পলায়ন, কবিতা সমগ্র, ১ম অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ২০১৫, পৃ ৫।

[3] উর্বশী – সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, নবম সংস্করণ, কলকাতা, এম সই সরকার অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ, ১৪১২, পৃ ৬৪।

[4] কাব্যপরিচয়, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৬৩।

[5] অথর্ববেদ ১৮/২/৩/১, বিজনবিহারী গোস্বামী (অনু. ও সম্পাদনা), অথর্ববেদ, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৮, পৃ ৪৭৬।

[6] অথর্ববেদ ১৮/৪/৪/৮, তদেব, পৃ ৪৯৮।

**খ. উপনিষদ:** 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যের প্রথম কবিতা 'পলায়ন'-এ কবি লিখেছেন 'উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে'। উমার[7] উল্লেখ পাওয়া যায় 'কেনোপনিষৎ'-এর তৃতীয় খণ্ড দ্বাদশ মন্ত্রে। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী।

'সোহবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি' কবিতার নামটি 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ'-এর প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ 'কণ্ডিকা' থেকে গৃহীত হয়েছে। স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী তৃতীয় ভাগে বলা হয়েছে – '(সেই প্রজাপতি) তিনি ভয় পাইলেন। এই জন্য (আজও) লোকে একাকী থাকিতে ভীত হয়।'[8] এই কবিতায় কবি জনারণ্যের মধ্যে নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছেন। ত্রিশঙ্কুকে[9] স্বর্গ থেকে অধঃশির হয়ে পড়ে যাওয়ার সময় বিশ্বামিত্র তাঁর পতন রোধ করে ঊর্ধ্বলোকে স্থান দেন। আধুনিক মানুষের মনে ভয় জাগিয়েছে অবলম্বনহীন পরিস্থিতি, যা ত্রিশঙ্কু-র সদৃশ। কবিতার ভাষ্যে –

'নিত্যকাল ধরে এই – দিন কাটে নিত্য তৃপ্তিহীন,
রাত্রিও প্রশান্তিহীন – ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয়।'[10]

'চোরাবালি' কাব্যের 'পঞ্চমুখ' কবিতায় পথের দুর্গমতা বোঝাতে 'ক্ষুরধার' শব্দটির অর্থ 'কঠোপনিষৎ' থেকে গৃহীত হয়েছে। 'ক্ষুরধার' হল – 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া দূর্গং পথস্তাৎ'[11]। কবিতার ভাষ্যে –

'ক্ষুরধার পথ দুর্গম দুরদেশ –
তীর্থযাত্রী খুঁজছে ভাবচ্ছবি।'[12]

তবু তাঁর পরিণতি, 'প্রায়োপবেশনে শশবিষাণ গোনা!'[13] প্রসঙ্গত এই 'শশবিষাণ' শব্দটি অত্যন্ত অসম্ভব বা অলীক বস্তুর উদাহরণ। সংস্কৃতে লেখা ভারতীয় দর্শনে শব্দটি ভুল ব্যবহৃত। শব্দটি কবি বিষ্ণু দে-র আরও দুটি কবিতায় পাওয়া যায় – 'উন্মনা' এবং 'সন্দীপের চর'। এই কবিতায় 'স্ত্রীপ্রজ্ঞা' ও 'মহাশ্বেতা'র প্রসঙ্গ এসেছে –

'জানি সে স্ত্রীপ্রজ্ঞা মাত্র, মানি যে সে সাধারণই মেয়ে,
মহাশ্বেতা নয়, তবু তার কথা মনে লাগে ভালো'[14]

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতমা স্ত্রী কাত্যায়নীর প্রসঙ্গে 'স্ত্রীপ্রজ্ঞা' বলতে নারীজনোচিত সাংসারিক মনোভাব বোঝান হয়েছিল।

'সন্দীপের চর' কাব্যের 'সমুদ্র স্বাধীন' কবিতায় লিখেছেন –

---

[7] উমা - অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা (১), ২য় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ), কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫ (২০০১), পৃ ২৩৫।

[8] বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১/৪/২। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, উপনিষদ গ্রন্থাবলী (৩), সম্পা. স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৫সং, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮০ ব. পৃ ৫৬।

[9] ত্রিশঙ্কু - অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা (১), প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫৫-৬৫৮।

[10] সোহবিভেত্তিস্মাদেকাকী বিভেতি, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮।

[11] কঠোপনিষৎ ১/৩/১৪ 'কঠোপনিষদ্'। উপনিষদ গ্রন্থাবলী (১), প্রাগুক্ত, পৃ ৯২।

[12] পঞ্চমুখ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮।

[13] তদেব।

[14] পঞ্চমুখ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।

'.. .. কিংবা ভাবোঃ
শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
চল্লিশশতাব্দী ধরে চল্লিশকোটি এক বাণী
গায় ক্ত সুরে ক্ত স্বরব্যঞ্জনের ভিন্ন ভিন্ন
বিন্যাসে বিন্যাসে কত ধ্বনি ব্যঞ্জনায় কত না মৃত্যুর
হুয়ামি তে মনসা মন'[15]

'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে'র (২/৫) মন্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে – 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ'। - কবিতায় চল্লিশ কোটি মানুষ সকলেই অমৃতের সন্তান।

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র (৫/১/১) মন্ত্রে উচ্চারিত প্রার্থনা ছিল –
'পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।'[16]

কবির অনুভবে সেই মন্ত্র হয়েছে –
'সে পূর্ণে পূর্ণের যোগে পূর্ণ রয় পূর্ণের বিয়োগে
পূর্ণই একাকী।'[17]

'অন্বিষ্ট' কাব্যের নাম কবিতার 'জবাকুসুমসঙ্কাশ' শব্দের ব্যবহার সূর্য প্রণামের মন্ত্রকে স্মরণ করায় –
'জবাকুসুমসঙ্কাশঙ কাশ্যপেয়ঙ মহাদ্যুতিঙ।
ধ্বান্তারিঙ সর্ব্বপাপাঘ্নঙ প্রণতোহস্মি দিবাকরং।'[18]

এই শ্লোকের 'জবাকুসুমসঙ্কাশ' শব্দটি সূর্যের লাল রঙের বিশেষণ ছিল। বর্তমান কবিতায় ঐ শব্দটি কবির কাছে লালা পতাকার বৈপ্লবিক আহ্বানকে সূচিত করে।

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' কাব্যের নামকবিতা আছে –
'রৌদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্যআকাশ
এই নিত্য অপঘাত দূর করো'[19]

'ঈশোপনিষদে'র পঞ্চদশ মন্ত্রের 'তত্ত্বঙ পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে' অংশের কাব্যিক অনুবাদ।

'ঈশাবাস্য দিবানিশি' কাব্যের 'ঈশাবাস্য' শব্দটি 'ঈশোপনিষদে'র প্রথম মন্ত্র 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং'[20] থেকে গৃহীত হয়েছে। 'ঈশা' শব্দের অর্থ পরমেশ্বর এবং 'বাস্যম্' শব্দের অর্থ আচ্ছাদনীয়।

---

[15] সমুদ্র স্বাধীন, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ২১০।

[16] বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৫/১/১, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, উপনিষদ গ্রন্থাবলী (৩), প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৯।

[17] সমুদ্র স্বাধীন, প্রাগুক্ত, পৃ ২১২।

[18] শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি, আহ্নিককৃত্য (১) [সংস্করণ অনুল্লেখিত], কলকাতা, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, [প্রকাশকাল অনুল্লেখিত], পৃ ১১২।

[19] স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৮।

[20] ঈশোপনিষৎ ১, ঈশোপনিষদ্, উপনিষদ গ্রন্থাবলী (১), প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

**গ. রামায়ণ:** 'চোরাবালি' কাব্যের 'বেকারবিহঙ্গ' কবিতায় 'রামায়ণে'র ত্রিশঙ্কু এবং জটায়ু-র কথা এসেছে। ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গ থেকে অধঃশির হয়ে পড়ে যাওয়ার সময় বিশ্বামিত্র তাঁর পতন রোধ করে ঊর্ধ্বলোকে স্থান করে দিয়েছিলেন। আলোচ্য কবিতায় বেকার যুবক-যুবতীর নিরালম্ব দশা বোঝাতেই ত্রিশঙ্কুর প্রসঙ্গটি কবি ব্যবহার করেছেন। 'রামায়ণে' জটায়ু সীতাহরণ আটকাতে চেষ্টা করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। জটায়ুর সেই কাহিনিকে রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যের 'দুঃসময়' কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে কবি বিষ্ণু দে লিখেছেন –

'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
কোরো না অন্ধ বন্ধ জটায়ুপাখা।'[21]

কবি বিষ্ণু দে পুরাকল্পটিকে প্রাণপণ চেষ্টার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

'পূর্বলেখ' কাব্যের 'বিভীষণের গান' কবিতার প্রসঙ্গ গৃহীত হয়েছে 'রামায়ণ' থেকে। বিভীষণ, রাক্ষসদের পক্ষ ত্যাগ করে মানুষদের পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং স্বধর্মের প্রতি তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছে। কবিতার ভাষ্যে –

'আহা! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ
মন্থিয়া নীল অগ্রচক্রঘর্ঘরে
লুকাব না কেউ প্রাকার ছায়ার গহ্বরে।
স্বাগত গেয়েছি স্বগতে নাচার দীর্ঘকাল,
হে বজ্রপাণি! স্বধর্মে মোরা সন্দিহান।'[22]

বিভীষণের এই অবসন্নতার কারণ স্বর্ণলঙ্কার অবক্ষয় –

'আত্মহনের আত্মরতিতে স্বর্ণহীন,
অতিপুষ্টির অতিসাররোগে বর্ণহীন
স্বর্ণলঙ্কা শোথাতুর, সব ধূমলকায়।
ভর্গে তোমার, বরেণ্য! করো খড়্গাহত।'[23]

এই 'শোথাতুর', 'ধূমলকায়'রাই স্বার্থান্ধ মানুষের প্রতীক। তাদের 'খড়্গাহত' করতে বরেণ্য ভর্গ-এর শরণাপন্ন। এই ভর্গ প্রসঙ্গ গায়ত্রী মন্ত্র স্মরণ করায় – 'তৎসবিতুর্বরেণ্যঙ ভর্গোদেবস্য ধীমহি'।

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে রাবণ পুষ্পকরথে চড়ে এসে সীতাহরণ করেছিল। কবির স্মৃতিতে পুষ্পকরথও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কের দিনে বিদেশি শত্রু-বিমানের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কবিতা ভাষ্যে –

'পূর্ণিমার ভয়াবহ চন্দ্রালোক! শত্রুদের পুষ্পকচালক
শুনেছি হদিশ পায় গৃহস্থ এ পূর্ণিমায়'

সীতাহরণের সময় বৃদ্ধ জটায়ু পাখি রাবণকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং রাবণের হাতে নিহত হয়। ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে বিশ্বব্যাপী যে প্রাণান্তিক প্রয়াস চলেছে, কলকাতাও তার সামিল হয়েছে, সেই তিমির হননকারী আলোকবর্ষী প্রতিরোধে সেও জটায়ু হয়ে উঠেছে।

---

[21] বেকার বিহঙ্গ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২।

[22] বিভীষণের গান, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭।

[23] বিভীষণের গান, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭।

**ঘ. মহাভারত:** 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যের প্রথম কবিতা 'পলায়ন'-এ কবি লিখেছেন 'উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে'। মহাভারতে উর্বশী চরিত্রটি-

'চোরাবালি' কাব্যের 'ওফেলিয়া' কবিতায় দেবযানী-র প্রসঙ্গ এনে কবি লিখেছেন –

'দেবযানী! সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে
ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে
শাপমোচনের সুরভি সুরের পাকে পাকে এই সাধনা আমার'[24]

ওফেলিয়া ও দেবযানী এই দুই নারীর প্রেমের বিপর্যয় আর যন্ত্রণাকে এইভাবে কবি স্পর্শ করেছেন।

'চোরাবালি' কাব্যের 'উলুপী' কবিতায় মগ্নচৈতন্যের সমুদ্রকে কবি ধরতে চেয়েছেন। কবিতা ভাষ্যে –

'সগরসন্তান সব জেগে ওঠে মনের গহ্বরে;
গন্ধর্ব কিন্নর সিদ্ধ যারা করে স্বপ্নশৈলে বাস,
উলুপীর জ্ঞাতি তাঁরা চেতনায় হাত ছুঁয়ে যায়,
সংখ্যাহীন বহু মূর্তি পরোক্ষ ছায়ায় পায় শ্বাস।'[25]

উলুপী হলেন কৌরব নাগের কন্যা। তাঁর জ্ঞাতি বলতে নাগকূলকে বোঝান হয়েছে। এই বিষন্ন সন্ধ্যায় কবির মনের গভীর জটিলতাকে সংস্কৃত সাহিত্যের রূপকল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

'চোরাবালি' কাব্যের 'যযাতি' কবিতাটির নামকরণ হয়েছে 'মহাভারতে'র আদিপর্বে উল্লেখিত চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র যযাতির[26] নামে। এই কবিতায় অপরিমিত ভোগতৃষ্ণার পরিচায়ক হিসেবে তাঁর নাম বিশেষণে উল্লেখিত হয়েছে –

'বসুন্ধরা অগ্নিউদরে লেগেছে দোলা,
শতসর্পিল ধূমকেতু তার অস্ত্র টানে।
মরণ আহরি আহারে বিবশ দিবশনিশা,
অশনায়াগ্র ধমনীশিরার পরমতৃষা
নিদ্রাহীনের রজনীতে চায় চরম ভোলা
স্নায়ুদাবদাহে যযাতি-শিরার প্রবল টানে।'[27]

'অশনায়া' শব্দটির উৎস 'ছান্দোগ্যপনিষৎ' এবং অর্থ ক্ষুধা। 'মহাভারতে' শুক্রাচার্যের শাপে বিগতযৌবন যযাতি ছোট ছেলে পুরুর কাছ থেকে যৌবন নিয়ে হাজার বছর ভোগ করার পর বুঝেছিলেন – তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না। এই প্রসঙ্গেই 'অশনায়াগ্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কবি এই যযাতি পুরাকল্পের মাধ্যমে আধুনিকতার বিপুল লোভকে ইঙ্গিত করেছেন।

---

[24] ওফেলিয়া, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

[25] সন্ধ্যা, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

[26] যযাতি – অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা (২), ১ম প্রকাশ, কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৯, পৃ ১৭৭-১৭৮।

[27] যযাতি – কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।

'অপস্মার' কবিতায় উগ্র কামবাসনা প্রসঙ্গে বিচিত্রবীর্য ও দশরথের প্রসঙ্গের অবতারনা করে কবি লিখেছেন:

'কোন বিচিত্রবীর্য কি
পূর্বজ কোনো দশরথ
রাজযক্ষ্মার ক্ষয়ভার
জায়ুজ ব্রণের ক্ষয়পথ
দায়ভাগে নির্লজ্জ কি
রেখে গেছে পিছে উপহার?'[28]

'মহাভারতে'র আদিপর্বে আছে শান্তনু আর সত্যবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্য অতিরিক্ত যৌনাচারের ফলে বিয়ের সাত বছরের মধ্যে যক্ষ্মা রগে মারা যান। কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরামপাঁচালী' অনুসারে দশরথের জ্বের মধ্যে ব্রণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

'পূর্বলেখ' কাব্যের 'নিরাপদ' কবিতায় মহাভারতীয় প্রেক্ষিতে কবি লেখেন 'অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থের কথা' –

'অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ
বনানীর বৈদেহী মর্মরে
ভরে ওঠে রোমাঞ্চ-কন্টকে।'[29]

'মহাভারতে'র সভাপর্বে ইন্দ্রপ্রস্থের অধিপতি পাণ্ডবদের কপট পাশাখেলায় শকুনির কাছে পরাজয় হয়েছিল আর দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে 'অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ'কে পরিত্যক্ত হিসেবে চিনিয়ে দেয়। আর কবিতার কথক সেই বিপর্যয়ের দিনে সঙ্গহীন হয়েও 'নিরাপদে সুখে দুঃখে শান্তিতে বা শোকের' প্রাত্যহিক যাপনে সেই 'নৈমিষকাল' কাটিয়ে দেন। কোন প্রতিকারের চেষ্টা না করেই। সাংখ্যদর্শনে পুরুষকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে। কথক নিজেকে 'দীনহীন সাংখ্যের পুরুষ' বলে উল্লেখ করে নিজের কাপুরুষতাকে আড়াল করতে চেয়েছেন।

'সাত ভাই চম্পা' কাব্যের 'প্রতিরোধ' কবিতায় দধীচি-র প্রসঙ্গ এসেছে। মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনি অনুযায়ী দধীচি আত্মত্যাগের পর তাঁর হাড় দিয়ে ইন্দ্রের বজ্র তৈরী হয়েছিল। সেই পুরাকথা ব্যবহার করে কবি লিখেছেন:

'অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য,
ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য, অসহায় হাতিয়ার,
তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেবে, লিখব প্রাণের ভাষ্য।'[30]

অন্যায়ের প্রতিরোধে আত্মদানকারী মানুষই কবির চোখে দধীচি হয়ে উঠেছে। 'সন্দীপের চর' কাব্যের 'আইসায়ার খেদ' কবিতায় পুনরায় দধীচির প্রসঙ্গ এসেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের দিনে খাদ্যের অভাবে মৃত মানুষের হাড় প্রসঙ্গে দধীচিকে স্মরণ করে কবি লিখেছেন:

---

[28] অপ্সমার, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।

[29] নিরাপদ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮।

[30] প্রতিরোধ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫।

'নরকে জানে না শুনি আছে তারা দুরন্ত নরকে,
রৌরব প্রাসাদে হাসে শাদাকালো গৌরব-প্রহরে!
দধীচির হাড় জ্বলে, কী দেয়ালি বিবস্ত্র মড়কে!'[31]

**ঙ. সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্য:** 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যের প্রথম কবিতা 'পলায়ন'-এ কবি লিখেছেন 'উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে'। মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে উর্বশী এবং পুরুরবার প্রণয়ের কাহিনি রয়েছে। উমা, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের নায়িকা। প্রসঙ্গত কবি বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' এবং 'তপোভঙ্গ' কবিতার দ্বারা বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এই চরিত্র দুটি সৃজনে।

'সাগড়উত্থিতা' কবিতায় উর্বশীকে বালিয়াড়ি পার হয়ে দেখেছেন। এই উর্বশী সমুদ্রমন্থনে নয়, সমুদ্রের বালিয়াড়ি পার হয়ে 'অকস্মাৎ আবির্ভূত চোখে / রৌদ্রে ও সুবর্ণে মেশা পরিপূর্ণ তনু বলীয়ান'[32]। আলোচ্য প্রথম কাব্যের 'আর্টেমিস' প্রতীচ্যের চরিত্র নন, পুরুরবার অনুসৃজন। মর্ত্যের রাজা পুরুরবার সঙ্গে শাপগ্রস্ত উর্বশীর কিছু সময়ের জন্য মিলন হয়েছিল। শাপ মুক্তির পরে উর্বশী স্বর্গে ফিরে যায়, আর পুরুরবাকে খুঁজতে থাকে। কবি জানেন তাদের প্রেম ক্ষণিক, তাই লিখেছেন –

'আমি নহি পুরুরবা, হে উর্বশী,
আমরণ আসঙ্গলোলুপ,
আমি জানি আকাশ-পৃথিবী
আমি জানি ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের।'[33]

'উর্বশী ও আর্টেমিস' কবিতায় কবি, ভবভূতির 'মালতীমাধব'-এর প্রস্তাবনার অনুকরণে লিখেছেন 'বিপুলা পৃথিবী আর নিরব্ধি কাল' (কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী[34])। 'মহাভারতে'র শকুন্তলার কাহিনির কন্বমুনির আশ্রম এবং অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার উল্লেখ করে কবি বিষ্ণু দে লিখেছেন –

'আজো তবু উর্বশীর স্তন
উর্বশীর পাণ্ডু উরু শুভ্র বাহু উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের চোখ
আমাদের করে রাখে তৃপ্তিহীন একাগ্র বৈরাগী।'[35]

'চোরাবালি' কাব্যের বিশিষ্ট কবিতা 'ঘোড়সওয়ার'। কবিতাটিতে 'মৃগতৃষ্ণিকা'র প্রসঙ্গ এসেছে – 'মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি?'[36] এই শব্দটি মরীচিকা অর্থে অপ্রচলিত শব্দের কাব্যিক সুষমাময় ব্যবহার করেছেন। শব্দটির পুনর্ব্যভার ঘটেছে এই কাব্যেরই 'কবিকিশোর' কবিতায়। তবে 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় প্রচলিত বাংলা শব্দ

---

[31] আইসায়ার খেদ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৯।

[32] সাগর উত্থিতা, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪।

[33] উর্বশী, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

[34] মালতীমাধব ১/৬, মালতীমাধবম্, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (১৭), ১ম প্রকাশ, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৪, পৃ ৩৫৪।

[35] উর্বশী ও আর্টেমিস, কবতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

[36] ঘোড়সওয়ার, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।

'মরীচিকা' ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ সংস্কৃত শব্দ যা বাংলা প্রায় নেই বললেই চলে - 'বিবমিষা', 'বেকারবিহঙ্গ', 'অপস্মার' (মৃগী) ইত্যাদি।

'চোরাবালি' কাব্যের 'ওফেলিয়া' কবিতায় দ্যাবাপৃথিবী অর্থে 'ক্রন্দসী' শব্দ ব্যবহার করে লিখেছেন - 'ক্রন্দসী বুঝি তোমাকেই ঘিরে ছড়ালো ধারা'। বলাবাহুল্য দুরূহ সংস্কৃত শব্দের (যা তৎসম শব্দরূপে গৃহীত হয়নি) সাবলীল ব্যবহার কবিকে বিশিষ্ট দক্ষতায় সম্মানিত করেছে।

'চোরাবালি' কাব্যের 'পঞ্চমুখ' কবিতার একটি অংশের শিরোনাম হিসেবে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের তৃতীয় সর্গের ৩৬ নং শ্লোকের উল্লেখ দেখা যায় - 'শৃঙ্গেন চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীঙ মৃগীমকণ্ডুয়তঃ কৃষ্ণসার'। অকাল বসন্তের এই শিরোনামটি কবির লিলির সঙ্গে কথোপকথনের পূর্বাভাস -

'অকাল দখিনা, ভেঙেছি কাজের কারা,
ছাতে চলো লিলি, সংসার যাক খসে।
হৃদয় পাখির মতো যে বন্ধহারা -
অকাল দখিনা, ভেঙেছি কাজের কারা -'[37]

অকাল বসন্তে অসময়েই সমস্ত প্রাণির মধ্যে যেমন রতির সঞ্চার হয়েছিল, লিলির প্রতি আবেগে তাকেই কবি স্মরণ করেছেন। তাই লিলির প্রতি তাঁর প্রেমকে 'অভ্যাস, শুধু অভ্যাস' বলেও শেষ পর্যন্ত বলেন -

'আমাদের ভালোবাসা প্রাকৃতিক, লিলি।'[38]

'পূর্বলেখ' কাব্যের 'মুদ্রারাক্ষস' কবিতার শিরোনাম গৃহীত হয়েছে বিশাখদত্তের প্রসিদ্ধ নাটক 'মুদ্রারাক্ষস' নাম থেকে। এই নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র রাজনৈতিক নাটক। ক্ষুরধারবুদ্ধি, কুটিল বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য নামান্তরে কৌটিল এই নাটকের নায়ক। এই কবিতার শুরুতেই কবি বলেছেন -

'আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই
চুকেছে যত কৌটিল্য ঘেঁষা
মারণাচারে ইষ্ট অন্বেষা।'[39]

আসলে এখানে ধনতন্ত্রের প্রতীক মুদ্রা, আর ধনতন্ত্র তথা ভোগবাদের কুটিল কদর্য মূর্তিই কবির কাছে রাক্ষসদের মতো প্রতিভাসিত হয়েছে। তাই তাঁর লেখায় অর্জুনের অভিশপ্ত পুরুষত্বহারা অজ্ঞাতবাসের ছদ্মবেশ বৃহন্নলার বেশ ধরেন যুগাবতার কল্কি। এখানে কল্কিকে অবন্মিত করা হয়েছে। সমস্ত কবিতা জুড়ে কৌতুকের সুরে এই অবনমনকে তুলে ধরা হয়েছে।

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যের শিরোনাম নির্বাচিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সাংগীতিক অনুষঙ্গ থেকে। 'কোমল গান্ধার' ভারতীয় সংগীতের রাগ বিশেষ। এই রাগ বিষন্নতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে কাব্যের নাম নির্বাচনে ভিন্ন একটি সূত্র বেশি গুরুত্বপূর্ণ - রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের 'কোমল গান্ধার' কবিতা থেকে এই নামটি নির্বাচিত হয়েছে।

---

[37] গার্হস্থ্যাশ্রম, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯-৪০।

[38] তদেব।

[39] মুদ্রারাক্ষস, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৪।

কবি বিষ্ণু দে-র প্রথম তিনটি কাব্যে বৈদিক এবং ঔপনিষদিক উল্লেখের প্রাচুর্য দেখা যায়। পরবর্তী কাব্যগুলিতে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্য (বিশেষত কালিদাস, ভবভূতি ও বানভট্ট) নানা অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। কবির সৃজনে ত্রিশঙ্কু আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গ জীবনকে ইঙ্গিত করেছে। নহুষ উদ্ধত নব্য-ধনী সমাজের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কবির শব্দচয়ন, পুরাকল্প, উদ্ধৃতি বা অনুবাদের ব্যবহারে পুনরাবৃত্তির প্রবণতা দেখা যায়।

**গ্রন্থপঞ্জি:**

১। ঋগ্বেদ সংহিতা (১), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৬।
২। গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পাদক) - উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮০।
৩। গুহ, অনিন্দ্যবন্ধু - সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব-অনুগ্রহঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে-র কবিতায়, গবেষণা সন্দর্ভ।
৪। চক্রবর্তী, জাহ্নবী - প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (১ম খণ্ড), ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০০৪।
৫। চক্রবর্তী, জাহ্নবী - প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (২য় খণ্ড), ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭১।
৬। দে, বিষ্ণু - কবিতা সমগ্র, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১ম অখণ্ড সংস্করণ, ২০১৫।
৭। দে, বিষ্ণু - প্রবন্ধ সংগ্রহ (১), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭।
৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার - পৌরাণিকা (১), ফার্মা কে এল প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২য় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ), ১৯৮৫।
৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ও বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতীম - বিষ্ণু দেঃ কালে, কালোত্তরে, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা পরিবর্ধিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯।
১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ - বঙ্গীয় শব্দকোষ, (১,২) সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ১ম সংস্করণ, (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ১৯৬৬।
১১। বেদব্যাস - মহাভারতম্ (১১), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪।
১২। শাস্ত্রী, গৌরীনাথ - সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (১০, ১৭), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪।
১৩। সরকার, সুধীরচন্দ্র - পৌরাণিক অভিধান, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৯ম সংস্করণ, ১৪১২।

**পত্রিকা:**

১। অনর্ঘ - ক্রোড়পত্রঃ বিষ্ণু দে জন্মশতবর্ষ, সম্পাদক মৃণালচন্দ্র হালদার, বইমেলা, ২০০৯।
২। আত্মবিকাশ - বিষ্ণু দে জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ২০০৯।
৩। কোরক - বিষ্ণু দে সংখ্যা, সম্পাদক তাপস ভৌমিক, বইমেলা, ১৪১৬।
৪। চান্দ্রমাস - বিষ্ণু দে সংখ্যা, সম্পাদক গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নভেম্বর, ২০০৯।
৫। বঙ্গদর্শন - বিষ্ণু দে স্মরণ-সমীক্ষণ, সম্পাদক সত্যজিৎ চৌধুরী, জানুয়ারি ২০০৮ - ডিসেম্বর ২০০৯।
৬। শিলীন্ধ্র - কবি বিষ্ণু দে সংখ্যা, সম্পাদক কমল মুখোপাধ্যায়, এপ্রিল-জুন, ২০০৯।